পাহাড় ধস রোধে স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

পাহাড় ধস রোধে স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাহাড় ও গাছ কাটা এবং স্থাপনা নির্মাণ বন্ধ, সকল লিজ বাতিল, অবৈধ বসতি উচ্ছেদ; নিহত-আহতদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ১৯ জুন '১৭ আবহাওয়ার বৈরী পরিবেশের মধ্যেও জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন-সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার আহবায়ক কমরেড বজলুর রশিদ ফিরোজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জাহেদুল হক মিলু, ঢাকা নগর কমিটির সদস্য সচিব জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন প্রমুখ।

সভায় বক্তাগণ পাহাড় ধসে ১৬৫ জনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, এটা যতটা না প্রাকৃতিক দুর্যোগ তারচেয়ে বেশি মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়। ২০০৭ সালে পাহাড়ে বিপর্যয়ের পরে গঠিত কমিটি পাহাড় ধসের ২৭টি কারণ চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য ৪৭টি সুপারিশ করেছিল। সুপারিশে ছিল পাহাড়ের ১০ কি.মি.এর মধ্যে ইট ভাটা ও ৫ কি.মি. এর মধ্যে আবাসন প্রকল্প নিষিদ্ধ এবং পাহাড় কাটা, লিজ দেয়া, জবর দখল দারিত্বের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার। কিন্তু গত ১০ বছরে এর কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো ৩ পার্বত্য জেলায় সংরক্ষিত বনের এক তৃতীয়াংশ অংশ ধ্বংস করা হয়েছে। ৬১% ঝরনা শুকিয়ে গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রজেক্টের নামে পাহাড়ের গাছ কেটেছে ও অবৈধ বসতি স্থাপন করেছে। নদী ও ঝরনাগুলো থেকে অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে পাহাড়ের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাকে রক্ষা করার পরিবর্তে তাকে ধ্বংস করার জন্য সমস্ত আয়োজনের কাজে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, লুটেরা-দুর্নীতিবাজরা ও বড় রাজনৈতিক দলগুলো যুক্ত।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতি বছর বর্ষা আসলেই পাহাড় ধসের আশঙ্কা থাকলেও স্থানীয় প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বাস্তবে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে না। ফলে প্রতিবছর হতাহতের সংখ্যা ও সম্পদহানির সংখ্যা বাড়ছে। বক্তাগণ অবিলম্বে ২০০৭ সালে গঠিত কমিটির পাহাড় ধস প্রতিরোধে যে সুপারিশ করেছিল তা বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও হতাহতদের সুচিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহনের জোর দাবি জানান। একই সাথে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে ধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনে হেলিকপ্টার ব্যবহারের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বি.এন.পি মহাসচিবসহ নেতৃবৃন্দের গাড়িবহরে সন্ত্রাসী হামলারও তিব্র নিন্দা জানান এবং দায়ীদের শাস্তির দাবি জানান।

পাহাড় ধস : মৃত্যু–কান্নার শব্দ কি ক্ষমতাসীনদের কানে যাবে?

পাহাড়ে ভূমিধসের ঘটনা এবারই প্রথম নয়। তবে ১৩ জুনের পাহাড় ধসের ঘটনা ভয়াবহতম। স্মরণকালের ভয়াবহ এই পাহাড় ধসের ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে ১৫৮ জন। স্বজন ও সহায়-সম্বল হারানো মানুষের আর্তহাহাকারে পাহাড়ে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই কান্না ও বেদনা কি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের হৃদয় স্পর্শ করেছে? করেনি। কারণ যে ভুল নীতি, দুর্নীতি ও পরিকল্পনার কারণে এই দুর্যোগ নেমে এলো সে ব্যাপারে কোন কথা আলোচিত হচ্ছে না। ফলে ভবিষ্যতে মৃত্যুর সংখ্যা এবং পাহাড় ধসের ঘটনা আরও বাড়ার আশঙ্কা আছে। এবার রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার-এই পাঁচ জেলার প্রায় ২০টি স্থানে পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে। এর আগে ২০০৭ সালে ১১ জুন চট্টগ্রাম মহানগরীর ৭টি স্থানে পাহাড় ধসে ১২৭ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন ।

২০০৭ সালে বিপর্যয়ের পর তৎকালীন উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন এর নেতৃত্বে যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল, তারা পাহাড় কাটা বন্ধ, অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং সুষ্ঠু পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেছিল। সে সময় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি পাহাড় ধসের ২৭টি কারণ চিহ্নিত ও ৪৭টি সুপারিশ করেছিল। যার মধ্যে ছিল পাহাড়ি এলাকায় ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কোন ইট ভাটার অনুমতি না দেয়া, পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কোন নতুন হাউজিং স্থাপন নিষিদ্ধ করা, একটি সংস্থা কর্তৃক পাহাড় কাটার অনুমোদনের ব্যবস্থা রহিত করা, পাহাড় লিজ দেয়া বন্ধ করা, জবরদখলকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা ইত্যাদি।

কিন্তু গত ১০ বছরে কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। বরং পাহাড় কেটে আবাসন পল্লি গড়ে তুলেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ২০০৬ সালে পাহাড় কেটে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস। ২৫ বছরে কেবল চট্টগ্রাম ও এর আশেপাশে ২৮ হাজার পাহাড় কাটা হয়েছে। গবেষকদের মতে, গত ৩০ বছরে চট্টগ্রামে আড়াই শতাধিক ছোট-বড় পাহাড় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।

জিও সায়েন্স অস্ট্রেলিয়ার এক গবেষণায় বলা হয়েছে, পাহাড় ধসের পিছনে প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভূতাত্ত্বিক গঠন। পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক গঠনে কঠিন শিলার অস্তিত্ব কম থাকলে মাটি সহজেই বৃষ্টির পানি শুষে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে মাটি নরম ও পিচ্ছিল হয়ে যায়। ফলে ভারী বর্ষণে মাটি ভেঙে পড়ে। এছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ, যেমন : ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এবং পাহাড়ের পাদদেশের নদী ও সাগরের ঢেউ থেকেও পাহাড় ধস হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে গাছপালা কেটে বনভূমি উজাড় করা এবং অপরিকল্পিত ভাবে পাহাড়ের পাদদেশ কেটে বসতি স্থাপন, বিভিন্ন অফিস-কার্যালয় , রাস্তাঘাট বানানোর ফলে পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটে চলেছে।

আমাদের দেশে অবস্থানরত পাহাড়গুলোর মধ্যে তিন ধরনের ভূতাত্ত্বিক গঠন রয়েছে। অধিকাংশ পাহাড় পাললিক শিলা দিয়ে গঠিত। এগুলো হলো বালুপ্রধান, স্যান্ডশেল অল্টানেশনস (বালু-মাটির স্তরবিশিষ্ট) ও কাদাপ্রধান পাহাড়। পাললিক শিলার পাহাড়গুলো ভূমিধসের অনুকূলে ও ঝুঁকিপূর্ণ।

১৯৬৪-৬৫ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় এর মোট আয়তন ১৩ হাজার ২৯৬ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ৭৭ দশমিক ৩ শতাংশ হলো পাহাড়। ১৯ শতাংশ টিলাভূমি। ৩ দশমিক ৩ শতাংশ সমভূমি। পাহাড়ের ৯ লাখ একর হলো সংরক্ষিত বন। প্রাকৃতিক বন বা সংরক্ষিত নয় এমন এলাকার পরিমাণ ১৭ লাখ একর।

ষাট থেকে আশির দশক পর্যন্ত এখানে মূলত ছিল সেগুন, গামারি, কদম ইত্যাদি গাছ। পাহাড়ে প্রাকৃতিক বন ও লতাগুল্মে ঘন গভীর বনায়ন ছিল, এখন নেই। ১৯৮৯ সালে তোলা ছবিতে দেখা যায়, পার্বত্য অঞ্চল ছিল গভীর বনভূমি। ২০০৩ সালে তোলা ছবিতে দেখা যায়, এ অঞ্চলে আগের মতো গাঢ় বন নেই। এটা অনেকটা হালকা বনে পরিণত হয়েছে। ১০১৫ সালে ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে তোলা পার্বত্য অঞ্চলের চিত্র ভিন্ন। পুরো বনভূমি কেটে কৃষিজমিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

ভূমি ও প্রকৃতি বিশেষজ্ঞদের মতে, এখন পাহাড় ন্যাড়া হয়ে গেছে। এজন্য বৃষ্টির পানি সরাসরি পাহাড়ের শিলাস্তরে প্রবেশ করে পাহাড়কে ঝুঁকিপূর্ণ করে। আগেও ভারী বৃষ্টিপাত হতো। লতাগুল্ম ও ঘন বনায়নের জন্য বৃষ্টির পানি পাহাড়ের শিলাস্তরে ঢুকতে পারত না। বৃষ্টির পানি পাহাড়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিচে চলে যেত। এ জন্য পাহাড়ের ভেতরের মাটির গঠন ঠিক থাকত।

ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় না নিয়ে কোন নীতিমালা ছাড়া পাহাড়ি ভূমিকে ব্যবহারের জন্য সরকার ইজারা দিতে শুরু করে। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এসব এলাকার ৫ থেকে ১০ একর পর্যন্ত বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এই প্রাকৃতিক বন বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে অনেকে এগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করছে। বন কেটে আড়াআড়ি রাস্তা, বসতি স্থাপনা, বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। বোমা মেশিন দিয়ে পাথর তোলা হচ্ছে। আম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু, পাম ও রাবার বাগান ইত্যাদি করা হয়েছে।

সিইজিআইএস এবং ওয়াটারএইডের এক গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৩ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৭ দশমিক ৫২ শতাংশ বা ৩ লাখ ৬২ হাজার ৩৬ হেক্টর প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করা হয়েছে। ৬১ শতাংশ ঝরনা শুকিয়ে গেছে এবং একই সময়ে ২৮ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ কৃষিজমি বেড়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এও) তৈরি 'গ্লোবাল ফরেস্ট রিসোর্সস এসেসমেন্ট : কান্ট্রি রিপোর্ট বাংলাদেশ' প্রতিবেদনে পাহাড়ের দুই বৃহৎ সংরক্ষিত বন কাসালং ও রাইংখাংয়েরর বিনাশের চিত্র তুলে ধরা হয়। ও প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশাল দুই অরণ্যে ১৯৬৩ সালে প্রাকৃতিক বন ছিল ১ লাখ ৭২ হাজার হেক্টর। ১৯৭০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৮৪ হাজার হেক্টর। ২০০৫ সালে পরিমাণ হয় ৭০ হাজার হেক্টর। এই বিনাশের ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

বর্ষা মৌসুমের আগেই পাহাড়ের ঝুঁকিপূর্ণ স্থান নির্ধারণ করার দায়িত্ব–বন বিভাগ, রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসনের। এবছর তিন পার্বত্য জেলার দুইটিতে সে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানও নির্ধারণ করা হয়নি। প্রশাসনের কাছে জনবসতির ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের কোন তালিকা নেই। ঝুঁকিপূর্ণ সড়কের তালিকা রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের কাছে থাকলেও তারা কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

জবাবদিহিহীন পরিকল্পনা, সীমাহীন লুটপাট চরছে সর্বত্র। পাহাড় এবং পাহাড়ের মানুষ তার সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতাসীনরা আরও ক্ষমতা চায়, পাহাড়ে দখলকারীরা আরও পাহাড় চায়, নদী দখরকারীরা আরও দখল করতে চায়, ভূমিগ্রাসীদের পেটের ক্ষুধা তো মিটতেই চায় না। দুনীতি-লুণ্ঠনকারীদের পাশে যদি রাষ্ট্র থাকে তাহলে তো তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠবে।

পাহাড় ধস চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো অর্থনীতি-রাজনীতিতে কত বড় ধস নেমেছে। উদ্ধার তৎপরতায় ধীর গতি, রাষ্ট্রের শোক প্রকাশে অনীহা দোষীদের চিহ্নিত করতে না চাওয়া দেখিয়ে দিল রাষ্ট্রের দায়িত্বের অবনমন কোন মাত্রায় পৌঁচেছে।

দেশের শ্রমজীবী মানুষ, নদী-হাওড়-পাহাড়সহ প্রাকৃতিক সম্পদ, সুন্দরবন সব আজ লুণ্ঠনের শিকার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলে দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। সবুজ পাহাড় ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছে কেন? কারা করছে? পাহাড়ের আদিবাসীরা নিশ্চয় করেনি? কি পরিকল্পনার কারণে এসব হচ্ছে তা উদ্ঘাটন এবং দূর করার সংগ্রামে আজ সচেতন মানুষদের পথে নামতে হবে। প্রকৃতি, মনুষ্যত্ব বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।